নিজের জন্য একটি ঘর

কাবেরী রায়চৌধুরী

এই মুহূর্তে মাধুরীকে সপাটে একটা থাপ্পড় মারল বিনায়ক। তারপর... মাধুরীর মান অপমান বোধ জেগে ওঠার আগেই সামান্য একটু শক্তি প্রয়োগ করে হাতের কব্জিটা মুচড়ে দিয়ে একটা দেঁতো হাসি হেসে ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় বলে গেল, ‘তেলটা

একটু বেশি হয়ে গেছিল। সামান্য ঝরিয়ে দিলাম ... মনে থাকবে নিশ্চয়ই।' দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিনায়ক চলে গেল বেড়ালের মতো নি:শব্দে।

বদ্ধ ঘরের মধ্যে সিগারেটের রিংগুলো তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মাধুরীর। দমবন্ধ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় দৌড়ে বাইরের বারান্দায় চলে এল। সাততলার ওপরে দূষণমুক্ত ঠান্ডা বাতাস বুক ভরে টেনে নিল। হাতটা বারান্দার গ্রিলের ওপর রাখতে গিয়ে টের পেল বিনায়কের শক্তি। কব্জির কাছটা এতক্ষণে ফুলে উঠেছে। হাতটা প্রসারিত করে হাত বোলালো অনেকক্ষণ। ভালবাসার চিহ্ন। হাতের কব্জিতে ভালবাসার জ্যামিতি।

এই ভালবাসার ঝোড়ো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সে ঘর ছেড়েছিল সাত বছর আগে। মনীশের ঘর। মনীশের অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদাসীনতায় একক থেকে এককতম হতে হতে, উষ্ণতার পারদ শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগে নামতে নামতে, সে যখন ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঠেছে, তখনই একটু উষ্ণতার খোঁজে, একটা উষ্ণ ঘরের খোঁজে, দ্বিতীয় আরেকটা সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে পায়রা হতে চেয়েছিল সে। আর তাই পৃথিবীর শীতলতম স্থান থেকে পা রেখেছিল বিনায়কের সাততলার ফ্ল্যাটে।

সেই ফ্ল্যাটে এখন মাধুরীর সঙ্গী সিগারেটের ধোঁয়ার রিং।

মাধুরী কব্জিটা দেখে হাসল একটু। ব্যথার তাপ ঘাড় পর্যন্ত উঠে আসছে ক্রমশ। তবু মুখে চোখে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে ; ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বাতাস, ভাল লাগছে মাধুরীর।

শহরের এই অঞ্চলটা দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। শহরের দূষণ থেকে সজীব টাটকা বাতাসের লোভে মানুষজন এদিকে এসে ভিড় বাড়াতে শুরু করেছে, গড়িয়ে থেকে সটান রাস্তা উত্তর-পূর্ব দিক ধরে পাড়ি দিয়েছে। বেশ কিছু বহুতল তৈরি হয়ে গেছে। বেশ কিছু আধা কনস্ট্রাকশন হয়ে পড়ে আছে। এই অর্ধনির্মিত বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে রইল মাধুরী। শূন্যে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে তার। বাড়িগুলো এখন অর্থহীন শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবল এই সব চৌকো বর্গক্ষেত্রগুলো

বাড়ি হয়েই সেজেগুছে থাকবে না ঘর হবে -- নরম মোলায়েম খুনশুটি নিয়ে। যদি ঘর না হয়, যদি মাধুরীর বাড়িগুলোর মতো পর্দা ঢাকা শীতল কবরস্থান হয় তাহলে ? ভাবতে ভাবতেই মাধুরীর চোখ গেল চার ফুট দূরত্বে বিনতাদির বারান্দায়। বয়েজ কাট চুলে অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে ব্রাশ চালাচ্ছেন মন দিয়ে, বিনতাদি।

মাধুরীকে বোধহয় অন্ধকার বারান্দায় দেখতে পাননি বিনতাদি, না হলেও এতক্ষণে গল্প জুড়ে দিতেন তিনি। বিনতাদির ঘর থেকে ভেসে আসা আলোর ঔজ্জ্বল্যে বিনতাদিকে কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পেল মাধুরী। চুল আঁচড়ানো ছেড়ে এবার তিনি আকাশের দিকে মুখ ফেরালেন। মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেলেন যেন অসীম শূন্যতার মাঝে। বিনতাদি কবি। প্রথিতযশা। বহু যুগ পার করে এসেছেন কবি স্তুতিতে। একটা সময়ে মাধুরী নিজে বিনতা সেনের কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল আর তখনই কবিখ্যাতির পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে টুকরো কিছু দুর্নাম শুনতে পেত। এখনও এই বয়সে এসেও গুনগুন নিন্দা তার পেছন ছাড়েনি। এর মধ্যে মুক্ত বাতাস নিচ্ছেন তিনি। বিনায়ক বলে, কবি আর লেখক। ওদের আবার চরিত্র। ওরা নিজেরাই একেকটা ভূত তাদের আবার ক্যারেক্টার ! কেন জানি গায়ে লেগেছিল মাধুরীর। বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, চরিত্র বলতে তোমরা কী বোঝ ?

-- সমাজ যা অনুমোদন করে তাই।

হেসে ফেলেছিল মাধুরী বিনায়কের চিন্তার প্রসারতা দেখে, বলেছিল, কোন সমাজ ? সমাজ তো বারে বারে তার চরিত্র পালটেছে। সতীদাহও এক সময় সমাজ অনুমোদিত ছিল। বিধবা ভ্রাতৃবধূকে অথবা পুত্রবধূকে সিডিউস করাও পরোক্ষভাবে এককালে অনুমোদিত ছিল। তুমি কোন সমাজের কথা বলছ ?

বিনায়ক যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে রেগে গেছিল, বলেছিল, তোমার তো ও ধরনের ব্যাপার-স্যাপারই ভাল লাগে ! একটু নষ্টামি না করলে নয় ?

-- আর তোমার ?

টু দ্য পয়েন্ট উত্তর দেওয়া এবারও হল না বিনায়কের, বলল, তা যাও না, আলাপ করে এসো একদিন কবি সাহেবার সঙ্গে। দ্যাখো কটা পাখনা গজায়।

বিনায়ক হেরে গেলেই রেগে যায় দেখে হাসি পেত মাধুরীর। হেসেছিল আর বলেছিল, যাব তো বটেই। আমার প্রিয় কবি আমার নেক্সট ডোর নেবার, আলাপ করব না ?

সেই ছ'বছর আগে আলাপ। কবি বিনতা সেন দূরত্বের পথ অতিক্রম করে এখন মাধুরীর বিনতাদি।

বিনায়কের সঙ্গে কথোপকথনের দিনই বিকেলে নিজে গিয়ে আলাপ করেছিল মাধুরী। আর সেই আলাপ এখন পল্লবিত হতে হতে গভীর হয়েছে। বিনতাদির অন্দরমহল থেকে মনের অন্দরেও মাধুরীর এখন অবাধ যাতায়াত। এই বিনতাদিই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠার পর একদিন আবেগের উচ্ছ্বাসে বলে ফেলেছিলেন, অনেক লড়াই, বুঝলে মাধুরী, অনেক লড়াই করতে হয়েছে জীবনে। ঘরে বাইরে সর্বত্র। এখন আর মনে পড়ে না কবে প্রথম খেলতে খেলতে লিখতে শুরু করেছিলাম। তবে বেশ কিছু লিখে ফেলার পর বুঝতে পারলাম লেখা ছাড়া আর কোনও কিছুই আমার দ্বারা হবে না। একদিন কোনও কাজে না লিখতে পারলে মনে হত আমি মরে গেছি। আমি আর বিনতা নই, আমি যেন অন্য কেউ হয়ে গেছি। সে যে কী কষ্ট বোঝাতে পারব না। তবে কী জানো শুধু লিখলেই তো হবে না, সেটাকে প্রকাশও করতে হবে ; আর সেখানেই যত ঝামেলা। এই লিখতে এসেই তখন অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হল যাদের মুখ কোনটা আর মুখোশ কোনটা তুমি বুঝতে পারবে না। একজন লেখককেও কেউ কুপ্রস্তাব দিতে পারে তুমি ভাবতে পারো !

মাধুরী বিনতাদির কথা শুনে অবাক হয়েছিল, বলেছিল, আপনি কেমন করে সে সব কাটিয়ে এলেন ?

কিছুক্ষণ ভাবলেন বিনতাদি, তারপর বললেন, ভাল লেখা আর জেদ দিয়ে। ... আত্মবিশ্বাস, ভাল সৃষ্টি আর জেদ এই যদি কারওর থাকে কে আটকাবে তাকে ? আমি তো তখন একেবারে একা। ঘরে বাইরে অজস্র অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই চলছে তখন। জানো হয়তো অনেকবার ঘর ভেঙেছি আমি। আসলে আমিই ভেঙেছি কি না জানি না, তবে ঘর ছেড়ে এসেছি এটা জানি। নিজের হাতে যত্ন করে সাজানো ঘর ! সেই ঘরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে আসা ! সে বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাও করেছি। তখন একদিকে লেখা বাঁচাচ্ছি একদিকে ঘর। কিন্তু ঘরটাকে যে শেষ পর্যন্ত বাঁচাবো সে শক্তি কোথায় পাব বলো তো ? তার জন্য আরেকটা হাত প্রয়োজন। না হলে ঘর ভেঙে যায় মাধুরী। চারবার ... চারবার ঘর বদল হয়েছে আমার। প্রথমে বাবার ঘর। তারপর স্বামীদের। অবনীর ঘর, অলকের ঘর, রূপকের ঘর, প্রবীনের ঘর। বিনতা সেনের কোনও ঘর ছিল না মাধুরী। একটি ঘরও বিনতা সেনের জন্য ছিল না। বার বার ভেঙে পড়েছি আবার উঠে দাঁড়িয়েছি, শুধুমাত্র নিজের একটা ঘরের জন্য।

-- তারপর ?

-- এই যৌবনের শেষ বেলায় পেলাম। এই যে ঘরটা দেখছো এটা বিনতা সেনের ঘর আর রমেন দেবের ঘর। আমাদের দু'জনের কাজ সেরে ফিরে দু'দন্ড শান্তিতে বেঁচে থাকার ঘর এটা। বলতে বলতে উদাস হয়েছিলেন বিনতাদি। হয়তো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ... চতুর্থ ঘরের কথা মনে পড়ে গেছিল।

মাধুরী জিজ্ঞেস করেছিল, একটা প্রশ্ন করব বিনতাদি ? কিছু মনে করবেন না তো ?

-- না, বলো।

-- আপনার স্বামীরা সবাই কি খুব খারাপ লোক ছিল ?

হাসলেন বিনতাদি, বললেন, ওরা তো সবাই আবার বিয়ে করেছে, সুখীও হয়েছে। তাহলে ওদের খারাপ বলি কী করে ? হয়তো আমার জন্য ওরা ঠিক ছিল না। আসলে

ওরা সবাই-ই চেয়েছিল বাঁধা সময়ের একজন স্ত্রী ; যে রাঁধবে-বাড়বে, সেজেগুজে সিনেমায় যাবে, স্বামীর ঘরে ফেরার জন্য চা হাতে বসে থাকবে ... আমি তো ঠিক তেমনটি ছিলাম না। হ্যাঁ আমিও ঘর ভালবাসতাম, ঘর গুছোতাম, রান্না করতাম, তারও ওপর লিখতাম। সভা-সমিতিতে যেতাম ..., সে সবই ওদের সবারই অপছন্দ ছিল। একজন কবিকে ফুলটাইম হাউস ওয়াইফ হিসেবে ওরা দেখতে চেয়েছিল। সেটাই আমি পারিনি ! যাক্, সবাই সব কিছু একসঙ্গে পায় না। দু:খ করে লাভ নেই।

বিনতাদির চোখের পর্দায় চারটে ঘরের ছায়া দেখতে পেয়েছিল সেদিন মাধুরী।

বিনতাদি এখনও তাকিয়ে আছেন দূরে কোথাও। এক হাতে চুলের ব্রাশ ধরা, অন্য হাত বারান্দার গ্রিলে। রমেনদা এই সময় নি:শব্দে বারান্দায় এলেন, বিনতাদির পিঠে একটা হাত রাখলেন নিগুঢ় ভালবাসায়। তারপর তাকিয়ে রইলেন দূরে আকাশের দিকে। নিস্তব্দ মুহূর্ত। অনেক দূরে প্রসারিত ওদের দৃষ্টি। কী ভাবছে ওরা দুজনে কে জানে ?

ওদের দেখতে দেখতে মাধুরীর মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল। এই মুহূর্তে এখন তার কাছে বিনায়কেরও অস্তিত্ব নেই, মনীশেরও না। একটা অস্তিত্ব তার কাছে পৃথিবীর শীতলতম স্থানের অনুভূতি, আর আরেকটা ধোয়ার রিং আর দূষণ। ন্নাহ্, দুটোর কোনটার কথাই এখন মাধুরীর মনে পড়ছে না।

কতক্ষণ ওরা এভাবে দাঁড়িয়েছিল কে জানে, হঠাৎ বিনতাদি ঘরের দিকে ফিরতে গিয়েই খেয়াল করলেন মাধুরীকে, বললেন, কী ব্যাপার একা একা ?

-- ওই আর কি, বলে প্রসঙ্গ এড়াতে চাইল মাধুরী, বলল আর নতুন কিছু লিখলেন বিনতাদি ?

-- হ্যাঁ। রোজই তো লিখছি। অনেকদিন আসোনি যে ... ? বর কোথায় ?

-- মায়ের কাছে।

-- কেন, কী হয়েছে ? শরীর খারাপ ?

-- না।

-- তাহলে এমনিই বুঝি ? বেড়াতে ?

-- না, ওর বাবা মারা যাবার পর থেকেই ও প্রায়ই মায়ের কাছে রাতে থাকে।

-- সে আবার কী ?

-- উনি নাকি নার্ভের রোগে ভুগছেন। একাকীত্ব নিরাপত্তার অভাব ... সব মিলিয়ে উনি নাকি অসুস্থ। তাই ছেলের সঙ্গ ছাড়া উনি বাঁচবেন না নাকি।

-- তা তুমিও তো একা ? তোমারও যদি নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয় ?

এতক্ষণ চেপে থাকা আবেগটা ঘনীভূত হয়ে এবার বাস্প হয়ে ভিজে উঠল মাধুরীর চোখের পাতা। বলল, হবে না। তারপরই এক দৌড়ে ভেতরে চলে এল সে। কান্না, কান্না আর কান্না। অপমানের কান্না, সহ্য শক্তির কান্না, পরাজয়ের কান্না ঘরে বন্দী হয়ে থাকা ধোঁয়ার মধ্যে মিশে গেল। মনে পড়ল ঠিক এই কথাটাই সে জিজ্ঞেস করেছিল বিনায়ককে, তোমার মায়ের একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে, আমার হবে না ?

-- তোমার ! তুমি তো ডাকসাইটে মেয়ে। তোমার নার্ভ অনেক শক্ত। তোমার আবার ভয় কী ? আমার মা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় বাবার সঙ্গেই কাটিয়েছে, তুমি তো সে রকম নও।

-- আমি কী ? বিনায়ক আমি কী ? গলা কেঁপে উঠেছিল মাধুরীর।

-- তুমি ? তোমার নার্ভ, হার্ট অনেক স্ট্রং। আমার মায়ের মতো তুমি নরম-সরম নও।

-- তা তো ঠিকই। তোমার মায়ের মতো স্বামীর ওপর অবাধ কর্তৃত্ব করতে পারিনি আমি। দাপট দেখাতে পারিনি আমি। শাড়ি আর গয়নার জন্য স্বামীকে শেষ করে দিতে পারিনি আমি। স্বামীর মৃত্যুশয্যাতেও যিনি তার গয়নাগুলো যক্ষের মতো আগলে রেখে দিতে পেরেছেন, আমি তা পারিনি আর পারবও না বোধহয়। ঠিকই তো ... তিনি না হলে আর এমন পতিব্রতা নারী কে হবেন ? আমি তো সর্বস্বান্ত হয়ে মনীশের দেওয়া ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটাও ছেড়ে দিয়ে অনায়াসে অন্যের ঘরে উঠেছি ! আমিই স্ট্রং।

-- শাট্ আপ ! বেশি বুকনি হয়েছে আজকাল। মনীশের কাছে তো ছিলে ফার্নিচারের মতো পড়ে। আমি না নিয়ে এলে ..., বেশি তেল হয়ে গেছে ... বলতে বলতে ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালো বিনায়ক। এক রাশ বিষাক্ত ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে ধোঁয়া কাটাবার চেষ্টা করল মাধুরী। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, বলল, এখন বদ্ধ ঘরে আর খেও না। জানোই তো আমার শ্বাসকষ্ট হয়।

-- কষ্ট হলে বেড়িয়ে যাও।

-- বিনায়ক ! আর্তনাদ করে উঠেছিল মাধুরী।

-- কী ? হ্যাঁ ? ঘর আমার ... আমি বাইরে যাব নাকি ?

মাধুরী আহত হয়েছিল, বলেছিল, সাতটা বছর কি অনেক বছর বিনু ? এরই মধ্যে এত পুরোনো হয়ে গেলাম ? তোমার মা-ই সব ? তাহলে বিয়ে করলে কেন ?

-- চপ্ ! য়ু ফুল ... আর একটা কথা নয়। গলা টিপে মেরে ফেলব এবারে। লোকে জানলে বলবে একটা কুলটা মরেছে। এর বেশি সিম্প্যাথি তুমি পাবে না।

-- আর তুমি ? সাধু পুরুষ ?

মাধুরীর কথা শেষ হয়নি। তার আগেই সপাটে থাপ্পড় এসে পড়ল তার গালে।

-- ব্বাহ্ ! বলার আগেই হাতটা নিয়ে মুচড়ে দিয়েছিল বিনায়ক, বলেছিল, মনে রাখবে আমার মা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছাড়েনি।

হয়তো সুযোগ ছিল না। তাই ..., ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মাধুরী।

বিনায়ক সিগারেটটা দাঁতে চেপে ধরে হাতটা আরও একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে দিতেই চিৎকার করে উঠেছিল মাধুরী। আর তারপর ধোঁয়ায় বিষাক্ত করে ঘর ছেড়েছিল বিনায়ক।

মাধুরী একা একা সব কটা ঘরে ঘুরে বেড়াল। চার কামরার বারোশো স্কোয়ার ফিটে শ্মশানপুরীর নীরবতা আর বুক ফাটা কান্না যেন এই মুহূর্তে পাকে পাকে জড়িয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণের খোলা জানালাটা দিয়ে এই মুহূর্তে দেখতে পেল সামনের ব্লকে সদ্য আসা তরুণ দম্পতিকে। বছর পঁচিশ হবে বোধহয় ছেলেটি আর মেয়েটি একটু ছোট। রোজ রাতে খাওয়ার পর ওরা হাত ধরে হাঁটে ছাদে। মাঝে মাঝে তার মধ্যেই ঘন বদ্ধ হয়ে খুনশুটি করে ছাদের অন্ধকারে। অন্ধকারের নিজস্ব আলোতেই দেখা যায় ওরা ঘন বদ্ধ হয়ে একে অপরের শরীরে লীন হয়ে যেতে চাইছে। মাধুরী রোজ ওদের দেখে। ভাল লাগে। আজ ওদের দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল ক'দিন আগেই দেখা বাসের ছেলেটাকে। মাধুরী বাসে বসেছিল। ছেলেটিও ছিল মাধুরী লক্ষ্য করেনি। বাস থেকে নামতেই পেছন থেকে ডেকে উঠেছিল, এক্সকিউজ মি !

-- হুঁ ?

আপনাকে মাঝে মাঝে দেখি ...

-- তো ?

-- না মানে ...

-- আমি ম্যারেড !

-- সো হোয়াট্ ?

-- বললাম।

-- কাউকে ভাল লাগার জন্য তাকে সব সময় আন্‌ম্যারেড হতে হবে এমন দিব্যি কোন ভগবান দিয়েছেন ? বাই দ্য ওয়ে, আমি সঞ্জয়। কৃষ্ণ বলে ডাকে সবাই, কালো তো তাই। বলতে বলতে হাসল সে। বলল, হংকং ব্যাঙ্কে আছি। আপনি ?

-- কমপ্লিট বেকার। হাউস ওয়াইফ।

-- ভুল। হাউস ওয়াইফরা বেকার হন না। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কাজগুলো তাঁরাই করেন।

থ্যাঙ্কস।

-- চলতে চলতে ঠান্ডা কিছু ... ? হাসল সঞ্জয়।

-- না। ধন্যবাদ।

-- রাস্তায় এক সঙ্গে দু পা হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয় কিন্তু। হয় না ?

-- সবার সঙ্গে নয়। আপনি কোথায় থাকেন ?

-- মুসাফির হুঁ ... না ঘর হ্যায় না ঠিকানা ... আবার হাসল সে। বলল, ঘর খুঁজছি। একলা থাকি। জন্মের পর পরই। মা-বাবা ওপরে গিয়ে বসে আছেন ... আমি হস্টেলে বড় হয়েছি।

-- বিয়ে ?

-- ঘরণী আর ঘর দুটোর খোঁজেই আছি।

ঘর। ঘর খুঁজছিল কৃষ্ণ। ঘরণীও। আরও একটা ঘর। নিজের জন্য একটা ঘর খুঁজতে হবে মনে হল মাধুরীর। স্বপ্নের ঘর। একবার মনে হল আর একবার লেখাপড়াটার ধার আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলে হয় না ? আর একবার ওই দম্পতির মতো হাতে হাত মিলিয়ে দুজনে দুজনাতে লীন হয়ে যাবার জন্য একটা ঘরের খোঁজ করলে হয় না ? নিজের ঘর। খুব কি অন্যায় হবে ? আর একবার 'টু লেট' লাগানো একটা ঘরের দিকে চোখ ফেরালে ?